



বীর শহীদ

মাহবুবুর রহমান সোহেল

জন্ম তারিখ:	২০ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯২
শাহাদাতের তারিখ:	৯ আগস্ট, ২০২৪
বিভাগ:	ঢাকা
জেলা:	নারায়ণগঞ্জ

শহীদের সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত

পেশা : মার্কেটিং ম্যানেজার, ইতিহাড এয়ার ওয়েস, পরিচালক, নস্ট্রাম হাসপাতাল এন্ড ডায়াগনস্টিক সেন্টার

শাহাদাতের স্থান: আজমপুর, উত্তরা, বনফুল দোকানের সামনে

শাহাদাতের বিস্তারিত ঘটনা ও ইতিহাস

বিবেকের ডাকে রক্তে লেখা

এক উচ্চবিত্ত বিপ্লব

মাহবুবুর রহমান সোহেল এ নামটি আর কেবল একটি পরিচিতি নয়, আজ তা একটি প্রতীক, একটি প্রতিধ্বনি, একটি পবিত্র আশ্রয়ের নাম। পেশায় ছিলেন কর্পোরেট কর্মকর্তা, পদমর্যাদায় সম্মানিত, জীবনচর্চায় অভিজাত; কিন্তু অন্তরযাত্রী হিসেবে ছিলেন এক বিপ্লবী আত্মা, যিনি দামী স্যুটের ভেতরে লুকিয়ে রেখেছিলেন শোষিতের প্রতি অসীম দরদেবর একটি ধুকপুক করা হৃদয়। নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জ উপজেলার ত্রিশকাহনিয়া গ্রামে তাঁর জন্ম, বাবা লুৎফুর রহমান খান ও মা সুরাইয়া আক্তার খানম দুজনেই প্রয়াত, কিন্তু বাঁদের হৃদয়ে ছিল সত্যতার উত্তরাধিকার। সেই উত্তরাধিকার সোহেল বয়ে বেড়িয়েছেন, শহরের আকাশচুম্বী দালানে থেকেও মাটির গন্ধ ভুলে যাননি।

তিনি ছিলেন উচ্চশিক্ষিত, মার্জিত, গভীরভাবে সংবেদনশীল এক মানুষ। কর্মজীবনে ছিলেন ইতিহাড এয়ারলাইন্সের মার্কেটিং বিভাগে, পরে দায়িত্ব নিয়েছেন নস্ট্রাম হাসপাতালের ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে। তবু তাঁর পরিচয় এখানেই থেমে যায় না। উত্তরার অভিজাত এলাকায় স্ত্রী মরিয়ম খানম রাখি ও তিন সন্তানের সাথে এক চমৎকার জীবনের ছায়া তিনি গড়ে তুলেছিলেন বড় ছেলে মশরুর, মেয়ে রুবাইদা রওজা, আর ছোট শিশু মারওয়া সূরা এই ছিল তাঁর অদ্ভুত সুন্দর সংসার, একটি ক্ষুদ্র অথচ পরিপূর্ণ জগত। কিন্তু ইতিহাস যাদের বেছে নেয়, তাদের শান্ত জীবন আর ধরে রাখা যায় না। জুলাই ২০২৪-এর বিপ্লব যখন রাজপথে আগুন হয়ে জ্বলছিল, নিরস্ত্র ছাত্রদের রক্তে যখন রাস্তাগুলো লাল হচ্ছিল, তখন মাহবুবুর রহমান সোহেল ঘরে বসে থাকতে পারেননি। তিনি বলেছিলেন বন্ধুকে “বিবেকের তাড়নায় ঘরে থাকতে পারছি না, আন্দোলনে যাচ্ছি। বেঁচে থাকলে আবার দেখা হবে।” কী অদ্ভুত, কী ভয়ংকর সত্যভেদী এই বিদায়বাক্য! যেন রবি ঠাকুরের কোনো চরণ, যেন প্রাচীন কোনো বিপ্লবীর অগ্নিঝরা কণ্ঠস্বর। জীবন তাঁর জন্য অনেক কিছু সাজিয়ে রেখেছিল অফিসের এসি কেবিন, ড্রাইভারের গাড়ি, সাপ্তাহিক পারিবারিক ভোজন, ছুটির দিনে সিনেমা অথবা সমুদ্র কিন্তু তিনি তা সব ফেলে এসেছিলেন একটি সামষ্টিক বিবেকের কাছে আত্মসমর্পণ করে। সেই বিবেক, যা আজকের সমাজে বিলুপ্ত প্রায়। রক্তাক্ত রাজপথে তিনি দাঁড়িয়েছিলেন একটি জাতির বিবেক হয়ে শুধু একজন সহানুভূতিশীল নাগরিক হয়ে নয়, একজন সক্রিয় সাক্ষী হিসেবে, যিনি না দেখে মুখ ফিরিয়ে নিতে জানতেন না। এই মানুষটি আমাদের মনে করিয়ে দেন, শহীদ হওয়া মানে কেবল গুলি খাওয়া নয়; শহীদ হওয়া মানে জীবনের সব আরাবের বিপরীতে গিয়ে একটা বৃহত্তর সত্যকে বেছে নেওয়া। তাঁর মৃত্যু আমাদের চোখে জল আনে, কিন্তু সেই অশ্রুতে রয়েছে আগুনের রঙ। কারণ সোহেল আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়ে গেছেন বিবেক যার আছে, সে চুপ থাকতে পারে না।

আজ তাঁর তিন সন্তানের চোখে নেই বাবার হাসিমুখ, স্ত্রী মরিয়মের হাতে নেই সেই পরিচিত কফির কাপ, যেটা সোহেল অফিসে যাওয়ার আগে চেয়ে নিতেন। কিন্তু এই পরিবারের হৃদয়ে রয়েছে এক গৌরব তাঁদের বাবা, তাঁদের স্বামী, ছিলেন সেই মানুষ, যাঁরা ইতিহাস লেখেন নিজের রক্ত দিয়ে।

আন্দোলনের প্রেক্ষাপট

২০২৪ সালের জুলাই আগস্ট বাংলাদেশের ইতিহাসের বুকের ওপর রচিত হয় এক দক্ষ শিরোনাম। এ ছিল শুধু আরেকটি আন্দোলন নয়, এ ছিল এক ফ্যাসিস্ট পর্দার চূড়ান্ত দৃশ্যপট উন্মোচনের মুহূর্ত, এক নিপীড়িত প্রজন্মের বিস্ফোরণ, যাদের দীর্ঘশ্বাস জমে ছিল বছরের পর বছর। কোটা সংস্কার আন্দোলন যেন ছাইচাপা আগুনের মতো বহুদিন ধরে জ্বলছিল অসাম্যের বিরুদ্ধে, দুর্নীতির বিরুদ্ধে, রাজনৈতিক প্রতারণা আর একনায়কতান্ত্রিক নাটকের বিরুদ্ধে। শেখ হাসিনার একতরফা নির্বাচনের পরে যখন কোটা প্রথার পুরনো প্রেতাওয়াকে আবার ফিরিয়ে আনার চেষ্টা হয়, তখনই জনতার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে পড়ে।

ছাত্রদের হাত ধরে শুরু হওয়া এই বিদ্রোহ অচিরেই ছড়িয়ে পড়ে জনমানসে চেতনাতে, রক্তে, ঘুমহীন রাতের নিঃশব্দ আতর্নাদে। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে শুরু করে শহরের মধ্যবিত্ত পাড়া, বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস থেকে শোশাল মিডিয়ায় ফ্রল সবখানে আলোড়ন তোলে এই আন্দোলন। তবে একে শুধুই রাজনৈতিক বলা ভুল হবে। এই ছিল শিক্ষা, সাম্য, ও মানবিক অধিকারকে কেন্দ্র করে তৈরি হওয়া এক নৈতিক অভ্যুত্থান, যেখানে কণ্ঠ ছিল নিরস্ত্র কিন্তু চেতনা ছিল আগুয়াক্সের চেয়েও বেশি শক্তিশালী।

এই সময় অনেকেই আড়ালে ছিলেন, জানালায় ফাঁক দিয়ে হয়তো তীব্রতা বুঝে নিয়েছিলেন, কিন্তু রাজপথে নামেননি। সেখানে মাহবুবুর রহমান সোহেলের ভূমিকা ছিল অনন্য, অনড়, অভূতপূর্ব। তিনি শুধু প্রতিবাদে অংশগ্রহণ করেননি, তিনি ছিলেন আন্দোলনের নেপথ্য সেবক, এক সাহসী ছায়াযোদ্ধা। যখন ছাত্ররা পুলিশের কাঁদানে গ্যাসে দম আটকে দাঁড়িয়ে ছিল,

তখন সোহেল ছুটে যাচ্ছিলেন খাবার, পানি, ও ওষুধ নিয়ে। তাঁর স্ত্রী মরিয়ম বলেন, “বাড়িতে থাকতে পারত না, ছুটফট করত।” সেই ছুটফটানি কেবল এক ব্যক্তির অস্থিরতা ছিল না, তা ছিল জাতির বিবেকের ছুটফটানি, এক নাগরিকের হৃদয় থেকে উঠে আসা চরম অনুশোচনা, যে দেখছিল তার দেশের সন্তানেরা রক্ত দিচ্ছে, আর সে অফিসে বসে শুধু ইমেইল পাঠাচ্ছে, এটা তো চলে না।

সোহেল অফিস থেকে হোম অফিসের ছুটি পেয়েছিলেন, কিন্তু তিনি সেই সময়ও কাটিয়েছেন রাজপথে। ১৬ জুলাই থেকে ৩১ জুলাই পর্যন্ত, প্রতিদিন, প্রতিক্ষণ, প্রতিনিমিষ তিনি ছিলেন ছাত্রদের ছায়া। এমনকি যখন গোলাগুলি, দমন-পীড়নের ভয় চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তখনো সোহেল পিছু হটেননি। তাঁর দেশপ্রেম কোনো কূটনৈতিক পাসপোর্টে ছিল না, ছিল রক্তমাখা সড়কের ওপর, ছাত্রের কাঁদাভেজা জামার পাশে, ব্যানারের নিচে দাঁড়িয়ে থাকা এক সাধারণ মানুষের হৃদয়ে।

সোহেলের সেই সিদ্ধান্ত “বিবেকের তাড়নায় ঘরে থাকতে পারছি না” শুধু এক ব্যক্তির শব্দ নয়, তা ছিল পুরো প্রজন্মের আওয়াজ, যা আজও বাতাসে ঘুরে বেড়ায়, গুলশানের টাওয়ারের আড়ালে, পুরান ঢাকার গলিতে, কিংবা পাবনার কোনো গ্রামে। তিনি নিজে থেকেই সেই চুক্তিতে সই করেছিলেন, যেখানে দেশের জন্য ভালোবাসা মানে ছিল প্রাণ উৎসর্গ। ইতিহাস এমন মানুষদেরই গ্রহণ করে, যারা নিজেদের ব্যথা নয়, জাতির যন্ত্রণাকে আগে অনুভব করে।

এই আন্দোলন তাই শুধু একটি রাজনৈতিক দাবি নয়, তা এক আত্মঘোষিত বিবেকের অভ্যুত্থান, যার নাম “জুলাই বিপ্লব”। আর সোহেলের মতো মানুষই সেই বিপ্লবের শ্রেষ্ঠ পুরুষ।

শহীদ হওয়ার করুণ কাহিনি এক অমর প্রস্থান, এক রক্তাক্ত প্রত্যয় (একটি জাতির বিবেকের শেষ নিঃশ্বাস)

৪ আগস্ট ২০২৪, বিজয়ের আগের দিন। দিনটি ছিল রোদের মতো অন্ধকার, বাতাস ছিল বুলেটের চেয়েও ভারী, আর রাজপথ জুড়ে ছড়িয়ে ছিল ছাত্রদের ক্লান্ত নিঃশ্বাস, জেগে থাকা চোখ আর অবিনাশী প্রতিজ্ঞা। উত্তরা আজমপুর বাসস্ট্যান্ড রবীন্দ্রস্মরণীর কোণে বনফুল মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের সামনে, যেন ইতিহাসের নির্ধারিত এক মঞ্চ। দুপুর ঠিক বারোট্টা, সূর্য দাঁড়িয়ে আছে মাথার উপর, আর সোহেল দাঁড়িয়ে আছেন রাষ্ট্রের মুখোমুখি বৃকে আগুন, চোখে নীরব বিদ্রোহ। পুলিশের গুলির মুখেও তিনি পিছু হটেননি, যেন চোখে চোখ রেখে বলেছিলেন, “তোমার ভয় দেখানো আমাকে স্পর্শ করবে না।”

সেই মুহূর্ত ছিল কোনও নটকের দৃশ্য নয়, কোনও চলচ্চিত্রের সংলাপ নয় তা ছিল এক জীবন্ত হৃদয়ের অন্তিম ঘোষণাপত্র। যখন গুলির শব্দ রাজপথ কাঁপিয়ে দেয়, সোহেল পড়ে যান মাথায় গুলির আঘাতে। তাঁর দেহ রক্তমাখা রাজপথে পড়ে থাকে অনেকক্ষণ, যেন রাষ্ট্র নিজেই চেয়ে দেখছিল—তাঁর রক্ত বইছে, অথচ কোনো সাহায্যের হাত বাড়ছে না। চারপাশে ছিল শুধু কাঁদানে গ্যাস, বুলেটের ঝড় আর পুলিশের অমানবিক ব্যারিকেড। সহযোগীরা তাঁকে ছুঁতে পারেননি প্রেম, সাহস, শ্রদ্ধা সব কিছুই গুলির ধাবায় জিম্মি হয়ে গিয়েছিল।

অবশেষে বহু ঝুঁকি নিয়ে তাঁকে উদ্ধার করা হয় প্রথমে নেওয়া হয় বাংলাদেশ মেডিকেল, পরে কচুক্ষেত হাইটেক হাসপাতাল, এবং শেষে ৫ আগস্ট স্থানান্তর করা হয় গুলশানের ইউনাইটেড হাসপাতালের আইসিইউতে। প্রতিটি হাসপাতাল যেন হয়ে উঠেছিল ব্যর্থতার স্মারক, যেখানে প্রযুক্তি, চিকিৎসা, মানবতা সব মিলেও তাঁর রক্তক্ষরণ থামাতে পারেনি। তাঁর মাথায় যে গুলি লেগেছিল, তা শুধু তাঁর দেহে নয়, এই জাতির ভবিষ্যতের কপালেও এক কফিন সিল করে দিয়েছিল।

৯ আগস্ট, শুক্রবার রাত সাড়ে এগারোটায় তিনি বিদায় নেন। কারও অশ্রুর অপেক্ষা না করেই, কারও রাষ্ট্রীয় সালাম ছাড়া, নিঃশব্দে চলে যান এক পরবর্তী ইতিহাসে। মৃত্যুর আগে পর্যন্ত তাঁর মুখে ছিল না নিজের সন্তানের নাম, স্ত্রীর আকৃতি, কিংবা নিজের বেদনাবোধ। তিনি বলে গেছেন দেশের কথা “ওরা যেন পিছিয়ে না পড়ে”, “ওদের খাবার পৌঁছেছে তো?”, “আমার জীবন শেষ হলে যেন আন্দোলন থেমে না যায়” এমন কথাগুলো বন্ধুরা আজও কাঁদতে কাঁদতে বলেন।

সোহেল কখনো বক্তা ছিলেন না। তিনি ব্যানারে ছিলেন না, সংবাদে ছিলেন না, দলের পোষ্টারে ছিলেন না। কিন্তু তাঁর উপস্থিতি ছিল পাথরের মতো অটল, পাহাড়ের মতো নীরব, অথচ প্রেরণার উৎস। তিনি নিজের কর্পোরেট জীবন, পরিবারের বিলাসিতা, তিন সন্তানের ভবিষ্যৎ সব কিছু বিসর্জন দিয়ে বেছে নিয়েছিলেন এক জাতির স্বপ্নের পাশে দাঁড়ানো। তিনি দেশকে প্রেম করেছিলেন প্রেমিকার মতো, ভালবেসেছিলেন সন্তানের মতো, বাঁচাতে চেয়েছিলেন পিতার মতো।

এই মৃত্যু তাই একটি হৃদয় থেকে যাওয়ার গল্প নয়। এটি এক বিবেকের সশরীরে আগুনে বাঁপ দেওয়ার ইতিহাস। এই মৃত্যু শুধু সোহেলের নয় এ রাষ্ট্রের ন্যায্যবিচারের, মানবিকতার, আর বিবেকেরও এক প্রকার পরাজয়।

আর আমরা, যারা এখনো বেঁচে আছি, আমাদের কাঁধে সেই রক্তের ভার। সেই প্রশ্নের ভার, “তাহলে আমরা কি সত্যিই একটি দেশ?”

পরিবারের বেদনা ও বেঁচে থাকার সংগ্রাম: এক রক্তাক্ত নিঃসঙ্গতা, এক অপ্রশমিত অপেক্ষা

জীবনের প্রতিটি কাহিনি যখন রক্ত ও কাঁটার অক্ষরে লেখা হয়, তখন শব্দ হারিয়ে যায় থাকে শুধু নিঃশ্বাস, অশ্রু, আর সেই দীর্ঘ অপেক্ষা, যেটা আর কোনোদিন শেষ হয় না। শহীদ মাহবুবুর রহমান সোহেলের বিদায়ের পর সেই অনন্তকালব্যাপী শোক যেন বাসা বেঁধেছে একটি ভগ্ন গৃহে, একটি নিঃসঙ্গ হৃদয়ে। মরিয়ম খানম রাখি, তিনি এখন আর শুধুই একজন স্ত্রী নন; তিনি এক বিধ্বস্ত মহাকাব্যের প্রধান চরিত্র, তিন সন্তানের মা, একজন যোদ্ধা, যিনি জীবনের প্রতিটি দিনে স্বামীর রক্তমাখা স্মৃতি নিয়ে বাঁচার চেষ্টা করছেন।

“আমার বাচ্চারা যেন রাষ্ট্র ও সমাজের কাছে বোঝা না হয়” এই বাক্য তিনি বলেন না, গলায় একধরনের আকৃতি গড়িয়ে পড়ে। মরিয়ম নিজে অনার্স পাস, একসময়ে স্বপ্ন দেখতেন সংসার, সন্তান আর স্বামীর হাত ধরে কিছুটা আরামদায়ক জীবনের। কিন্তু আজ? আজ তাঁর সব স্বপ্ন কফিনবন্দি, রক্তরঞ্জিত একটি খাটের কোণায় পড়ে থাকা সোহেলের শেষ জামার মতো অব্যবহৃত, অপূর্ণ।

তিনি চান না দয়া বা করুণা তিনি চান কেবল একটি সম্মানজনক চাকরি, একটি নিরাপদ আশ্রয়। কারণ তাঁর কাছে এ লড়াই কোনো এক নারীর অভাবের গল্প নয় এ লড়াই এক শহীদের পরিবারের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য, যেখানে সন্তানদের চোখে বাবার ছবি শুধু ফ্রেমে নয়, ভবিষ্যতের প্রতিটি কোণায় বেঁচে থাকুক।

আর সেই ছোট্ট শিশুটি মারওয়া সুরা যার বয়স ছিল মাত্র এক বছর চার মাস, এখনও ঠিক বুঝে উঠতে পারেনি বাবার মৃত্যু কাকে বলে। দরজার কলিং বেল বাজলে সে ছুটে গিয়ে বলে, “বাবা!”—এই একটি শব্দে যেন হাজার বছরের কান্না জমে আছে। কিন্তু কোনো দরজা আর খোলে না, কোনো বাহুড়োর আর প্রসারিত হয় না। সেই শব্দ শুধু এক অনুত্তর প্রশ্ন হয়ে দেয়ালে ধাক্কা খায় এই দেশে কি বাবারা সত্যিই ফিরে আসে?

বড় ছেলে মাশরুর, এখনো সরলভাবে বলে, “আমার বাবা খুব ভালো মানুষ ছিলেন। আল্লাহ নিশ্চয়ই ওনার জন্য ভালো রেখেছেন।” শিশুর মতো সেই বিশ্বাস যেটা টিকে আছে শুধু প্রার্থনায়, আশা আর বাবার রেখে যাওয়া সাহসিকতায়। এই পরিবারের স্বপ্ন এখন খুব ছোট একটি চাকরি, একটু সম্মান, কিছু সুরক্ষা, একটু ভবিষ্যৎ।

কিন্তু রাষ্ট্র? রাষ্ট্র কি সত্যিই এই শহীদের পরিবারকে মর্যাদা দিতে পেরেছে? নাকি শুধু শোকসভায় ফুল দিয়ে দায় সেরেছে? সোহেল ছিলেন না শুধুই একজন কর্পোরেট অফিসার, তিনি

ছিলেন সমাজের প্রতিচ্ছবি একজন সাহসী, শিক্ষিত, ন্যায়নিষ্ঠ নাগরিক, যিনি নিজের জীবন উৎসর্গ করেছেন ভবিষ্যতের জন্য। অথচ সেই ভবিষ্যতের পথ আজ তাঁর পরিবার চলেছে নীরব, নিঃসঙ্গ, অবহেলিত।

মরিয়ম খানম রাখির চোখে কোনো জল নেই শুধু প্রতিজ্ঞা আছে, “ওর আত্মত্যাগ বৃথা যেতে পারে না, কোনোভাবেই না।” এই প্রতিজ্ঞার ভার নিয়েই তিনি বেঁচে আছেন একটি দেশের বিবেকের অবশিষ্ট আলো হিসেবে। তাই, এই পরিবারকে ভুলে গেলে আমরা শুধু একটি পরিবারকেই নয়, পুরো জাতিকেই ভুলে বসি।

এক নজরে শহীদ মাহবুর রহমান সোহেল

নাম : মাহবুর রহমান সোহেল

পেশা : মার্কেটিং ম্যানেজার, ইতিহাড এয়ার ওয়েস,

: পরিচালক, নস্ট্রাম হাসপাতাল এন্ড ডায়াগনস্টিক সেন্টার

জন্মস্থান : ত্রিশকাহনিয়া, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ

বর্তমান ঠিকানা : ৬ তোরা, পূর্ব ঢাকা (পূর্বে উত্তরা নিজস্ব ফ্ল্যাট)

পিতা : মৃত লুতফর রহমান খান

মাতা : মৃত সুরাইয়া আক্তার খানম

স্ত্রী : মরিয়ম খানম রাখি

সন্তান : মারুফ (১২ বছর), রুবাইদা (১০ বছর), মারওয়া (১ বছর ৪ মাস)

গুলিবিদ্ধ হওয়ার তারিখ ও সময় : ৪ আগস্ট ২০২৪, দুপুর ১২টা

স্থান : আজমপুর, উত্তরার বনফুল ভাণ্ডারের সামনে

মৃত্যুর তারিখ ও সময় : ৯ আগস্ট ২০২৪, রাত ১১:৩০

মৃত্যুস্থান : ইউনাইটেড হাসপাতাল

দাফনের স্থান : মায়ের কবরের পাশে, জাম্মাতুল মাওয়া কবরস্থান, মিরপুর ১১

প্রস্তাবনা

১। রাষ্ট্রের উচিত তাঁকে রাষ্ট্রীয়ভাবে শহীদের স্বীকৃতি দেওয়া

২। শহীদের স্ত্রীর একটি স্থায়ী চাকরি দেওয়া

৩। তাঁর সন্তানদের জন্য সম্পূর্ণ শিক্ষা বৃত্তির ব্যবস্থা করা

পবিত্র কুরআনের বাণী

আর যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে তাদেরকে কখনোই মৃত মনে করো না; বরং তারা জীবিত এবং তাদের রবের কাছ থেকে তারা জীবিকা-প্রাপ্ত হয়ে থাকে। (সূরা আল-ইমরান ৩:১৬৯)

হাদীস শরীফ

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, “শহীদদের জন্য জাম্মাতে ৭০ জন আত্মীয়ের জন্য সুপারিশ করার অধিকার থাকবে।” (সুনান আবু দাউদ ২৫২০)

দোয়া পাঠ: ০ জন

শহীদের স্মৃতিচিত্র ও ফটো গ্যালারি



